ইউনিট- ১

কৃষি, জলবায়ু ও মাটি

ভূমিকা

কোন দেশের আবহাওয়া সম্পর্কে জানা থাকলে সে দেশের জলবায়ু সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। আবহাওয়া বলতে কোন স্থানের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যকিরণ, বায়ুর চাপ, কুয়াশা ইত্যাদির সামগ্রিক অবস্থাকে বুঝায়। এমনিভাবে কোন স্থানের বা অঞ্চলের কৃষিকে প্রভাবিত করে এমন আবহাওয়ার ২৫ - ৩০ বছরের গড়কে কৃষি জলবায়ু বলে। পৃথিবী পৃষ্ঠের অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণী মাটিকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে। মাটি হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগের প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের সমষ্টি, যা সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ, পানি প্রবাহ ইত্যাদির প্রভাবে সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। মাটি গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। গাছপালা ও অন্যান্য জীব-জন্তুর বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি ও বিবর্তন সে এলাকার জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়; এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের গাছপালা ও জীব-জন্তু বিভিন্ন ধরনের।

এ ইউনিটে পাঁচটি পাঠে কৃষি আবহাওয়া, জলবায়ু, মাটির গঠন ও উর্বরতা, ভূমিক্ষয় ও সংরক্ষণ এবং উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ-১.১ : জলবায়ু ও কৃষি আবহাওয়া

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কৃষি আবহাওয়ার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষি আবহাওয়া ভিত্তিক অঞ্চলগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- জলবায়ু বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- ফসল উৎপাদনে কৃষি আবহাওয়া ও জলবায়ু ভিত্তিক মৌসুমগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

কৃষি আবহাওয়া

কৃষি আবহাওয়া বলতে মূলত কোন স্থানের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর চাপ ইত্যাদি নিয়ামক যা ফসল উৎপাদন ও কৃষিকাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করে তার দৈনিক সমষ্টিগত অবস্থাকে বুঝায়। ফসল উৎপাদন সরাসরি কৃষি আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল।তাই বাংলাদেশে সাধারণত আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে ফসল চাষাবাদের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুর আর্দ্রতার বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। এ কারণে বিশেষ কোন অঞ্চলে নির্দিষ্ট কোন ফসল ভাল জন্মে। কৃষি আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান কৃষি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যথা-

(১) **উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল :** রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা ও খুলনা বিভাগের উত্তরাংশ।

(২) **উত্তর-পূর্বাঞ্চল :** ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল।

(৩) দক্ষিণাঞ্চল : ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগসমূহের দক্ষিণাঞ্চল।

এ সব অঞ্চলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদিত ফসল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(১) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল : এ অঞ্চলে শীতকালে অধিক শীত এবং গ্রীষ্মকালে অধিক গরম অনুভূত হয়। এখানকার উলে- খযোগ্য ফসল : ধান, পাট, গম, আলু, ইক্ষু, শীতকালীন শাকসব্জি, আম, লিচু, তামাক, পটল, মরিচ, ডাল ইত্যাদি।

(২) উত্তর-পূর্বাঞ্চল ঃ এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। শীতকালে তাপমাত্রা কম থাকে। এ অঞ্চলের প্রধান ফসলগুলো হচ্ছে- পাট, চা, আনারস, কমলালেবু, তৈলবীজ, শাকসব্জি ইত্যাদি।

(৩) দক্ষিণাঞ্চল : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম। সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় এ অঞ্চলের বাতাসে আর্দ্রতা বেশি। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশি। এ অঞ্চলের প্রধান ফসলঃ ধান, নারিকেল, সুপারি, গোলপাতা, বিলেতি গাব, পান, কলা, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

চিত্র : বাংলাদেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া ভিত্তিক মানচিত্র।

জলবায়ু

কোন স্থানের বা অঞ্চলের ২৫-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড়কে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। সারা বছর যে জলবায়ুর উলে-খযোগ্য পরিবর্তন হয় না তাকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলা হয়। বাংলাদেশের জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন। ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি আবহাওয়ার সাথে সাথে জলবায়ুও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনের জন্য জলবায়ুর ভিত্তিতে সারা বছরকে প্রধান দুটি মৌসুমে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

(১) রবি মৌসুম ও

(২) খরিপ মৌসুম

এসব মৌসুমের বৈশিষ্ট্য ও প্রধান উৎপাদিত ফসল উল্লেখ করা হলোঃ

(১) রবি মৌসুম : আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য মার্চ) পর্যন্ত সময় কালকে রবি মৌসুম বলে। এ মৌসুমে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা কম থাকে। বৃষ্টিপাতও কম

হয়। এ সময় শীতকালীন শাকসবজি যেমন-ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, গাজর, লাউ, সীম, টমেটো, আলু ইত্যাদির চাষ করা হয়। এ ছাড়া বোরো ধান, গম, ডাল ও সরিষা রবি মৌসুমের ফসল।

(২) খরিপ মৌসুম

খরিপ মৌসুমকে পুনরায় দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) খরিপ-১ : ফাল্গুন মাস হতে আষাঢ় মাস (মার্চ মাস থেকে জুলাই মাস) পর্যন্ত সময় খরিপ -১ এর অন্তর্ভুক্ত। এ সময়কালকে গ্রীষ্মকালও বলা হয়। এ সময় তাপমাত্রা বেশি থাকে। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হয়। এ মৌসুমে আউশ ধান, পাট, ঢেঁড়শ, করলা, পটল, কাঁকরোল, বরবটি ইত্যাদি ফসলের চাষ হয়। আম, জাম, কাঠাল, লিচু, পেঁপে ইত্যাদি এ মৌসুমের প্রধান ফল।

(খ) খরিপ-২ : আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস (মধ্য জুলাই থেকে মধ্য অক্টোবর) পর্যন্ত সময়কাল খরিপ-২ এর অন্তর্ভুক্ত। এ মৌসুমে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ মৌসুমকে তাই বর্ষাকাল বলে। আমন ধান ও বর্ষাকালীন শাকসবজি এ মৌসুমের প্রধান ফসল। প্রধান ফলের মধ্যে : জাম্বুরা, তাল, আমলকি, কাঁঠাল, জলপাই উল্লেখযোগ্য।

সারমর্ম

- কৃষিকাজে প্রভাব বিস্তার করে এমন কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট স্থানের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুরচাপ ইত্যাদির দৈনিক সমষ্টিগত অবস্থাকে আবহাওয়া বলে।
- কোন স্থানের বা অঞ্চলের ২৫-৩০ বছরের কৃষি আবহাওয়ার গড়কে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের কৃষি জলবায়ু বলে।
- কৃষি আবহাওয়ার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান কৃষি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। যথা– উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল।
- কৃষি জলবায়ুর ভিত্তিতে সারা বছরকে প্রধান দুটি মৌসুমে ভাগ করা যায়, যথা– রবি মৌসুম ও খরিপ মৌসুম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

১। কোন স্থানের কৃষি আবহাওয়ার কত বছরের গড়কে কৃষি জলবায়ু বলে?

(ক) ২৫-৩০ বছরের (খ) ১৫-৩০ বছরের

(গ) ১০-১৫ বছরের (ঘ) ২০-২৫ বছরের।

২। কৃষি আবহাওয়া ভিত্তিক চিহ্নিত তিনটি কৃষি অঞ্চলের নাম কী?

(ক) উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর-দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল

(খ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল

(গ) উত্তর-দক্ষিণাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল

(ঘ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল

৩। কোন মৌসুমকে বর্ষাকাল বলা হয়?

(ক) খরিপ-২ (খ) খরিপ-১

(গ) রবি মৌসুম (ঘ) কোনটিই না

৪। নিচের কোনগুলো রবি মৌসুমের ফসল?

(ক) করলা, পটল ও কাঁকরোল (খ) জাম্বুরা, তাল ও কাঁঠাল

(গ) ফুলকপি, বাঁধাকপি ও মূলা (ঘ) ঢেঁড়শ, পুঁইশাক ও মিষ্টি কুমড়া

পাঠ-১.২ : মাটি ও মাটির গঠন

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাটির সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- মাটি গঠনের উপাদানগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- মাটির উপাদানগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মাটির প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

মাটি

মাটি একটি মিশ্র পদার্থ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবী প্রথমে একটি জলন্ত অগ্নিগোলকের পিন্ড ছিল। দীর্ঘকাল ধরে তাপ বিকিরণ করতে করতে এর বাহিরের অংশ ঠান্ডা হয়ে শিলাময় শক্ত ভূত্বকের সৃষ্টি করে। তাপ, পানি, বাতাস ইত্যাদির নৈসর্গিক প্রভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষয়ীভূত হয়ে কালক্রমে এ ভূত্বকের বাহিরের স্তর কোমল হয়ে আসে এবং মাটির সৃষ্টি হয়। জীবজন্তু ও গাছপালার দেহাবশেষও মিশে মাটির অংশে পরিণত হয়। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, ক্ষয়ীভূত শিলা ও নানা প্রকারের জৈব পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত ভূ-ত্বকের বাইরের যে স্তরে গাছপালা জন্মে এবং যে স্তর থেকে গাছপালা পুষ্টি উপাদান শোষণ করে বেঁচে থাকে তাকে মাটি বলে। বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থ, অজৈব পদার্থ, পানি ও বায়ু দ্বারা গঠিত মাটি এক অন্য মাধ্যম। এ মাটিতেই চাষাবাদ করে মানুষ শস্য ফলায়, আর মাটিতেই বাড়িঘর করে মানুষ জীবন কাটায়।

মাটি গঠনের উপাদান

মাটি প্রধানত চারটি উপাদান দ্বারা গঠিত। এগুলো হলো:

(১) অজৈব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ

(২) জৈব পদার্থ

(৩) পানি

(৪) বায়ু

(১) অজৈব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ

ভূপৃষ্ঠ প্রকৃতপক্ষে শিলা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তি তথা তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, তুষারপাত, বায়ু ও পানি প্রবাহ ইত্যাদির প্রভাবে সময়ের ব্যবধানে আদি শিলা চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে মাটির অজৈব বা খনিজ পদার্থ সৃষ্টি করেছে। অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের অক্সিজেন মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ এবং সিলিকা জাতীয় যৌগিক পদার্থের সমন্বয়ে মৃত্তিকার অজৈব বা খনিজ অংশ গঠিত। বালিকণা, কর্দমকণা, পলিকণা ইত্যাদি হচ্ছে খনিজ পদার্থ। এসব খনিজ পদার্থ বিভিন্নভাবে মিশে মাটির বুনট সৃষ্টি করে। মাটির বুনট ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাটির অজৈব বা খনিজ পদার্থগুলো পরস্পর মিশে যৌগিক কণা গঠন করলে

তাকে মাটির দানাবন্ধন বা গঠন বলে। মাটিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ।

(২) জৈব পদার্থ

উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের পচনশীল ধ্বংসাবশেষই মৃত্তিকার জৈব পদার্থের প্রধান উৎস। এসব অবশেষ প্রায় সব সময়ই পচনক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। মাটিতে প্রায় শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকে। এ জৈব পদার্থের কাজ হলো মাটির ভৌত গুণাবলীর উৎকর্ষ ঘটানো এবং মাটির আঠালোভাব কমানো। ভারি কাদা মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থের মিশ্রণ ঘটালে মাটি হালকা হয় এবং মাটির গঠন উন্নতমানের হয়। জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয়। কেননা জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে মাটির অণুজীবগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় যা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সৃষ্টির জন্য সহায়ক। এছাড়া জৈব পদার্থ মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ বাড়িয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।জৈব পদার্থ উদ্ভিদের খাদ্যোপাদানসমূহ সরবরাহ মাটিতে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মাটির মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচলে সহায়তা করে। এছাড়া মাটির গঠন ও সংযুক্তির উন্নতি ঘটায়।

(৩) পানি

মাটির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পানি। মাটির মধ্যে কিছু না কিছু পানি বিদ্যমান থাকে। বৃষ্টিপাত, বায়ুমন্ডলের জলীয়বাষ্প ভূ-মধ্যস্থ পানি ও সেচ ব্যবস্থা থেকে মাটি পানি লাভ করে। মাটির পানিই গাছের খাদ্য উপাদানগুলোকে দ্রবীভূত রাখে এবং মাটিকে রসালো করে। ফলে গাছপালা সহজেই পুষ্টি উপাদান দ্রবীভূত অবস্থায় শোষণ করে নেয়। মাটিতে সাধারণত শতকরা ২৫ ভাগ পানি থাকে।

(৪) বায়ু

গাছপালার জীবন ধারণের জন্য বায়ু একান্ড় প্রয়োজন। মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। ভূমি প্লাবিত হলে মাটিতে বায়ুর পরিমাণ হ্রাস প্রায় এবং পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। জমি চাষ করলে মাটিতে বায়ুর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্থুল কণাবিশিষ্ট মাটির সূক্ষ্মকণাবিশিষ্ট মাটির চেয়ে বায়ুর ধারণ ক্ষমতা বেশি। মাটিতে বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বনডাই অক্সাইড ছাড়াও থাকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস। মাটিতে বায়ুর পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি মাটিস্থ পানির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। মাটিতে শতকরা ২৫ ভাগ বায়ু থাকে।

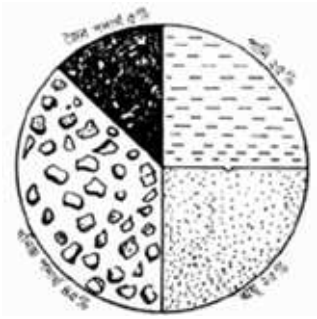

চিত্র : মাটি গঠনের প্রধান উপাদান।

মাটির প্রকারভেদ

মাটির অজৈব বা খনিজ অংশ বিভিন্ন আকারের ও আয়তনের কণা সহযোগে গঠিত। মাটির কণা বলতে মাটিতে উপস্থিত বালি, পলি ও কর্দম কণাকে বুঝায়। কোন কোন মাটির কণা স্থূল ও মোটা, আবার কোন কোন মাটির কণা সূক্ষ্ম। আকার অনুসারে মাটির একক কণার পারস্পরিক সমন্বয়কে বুনট বলে। কণার ভিন্নতার জন্য মাটির গুণাবলী বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। কণার আয়তন ভেদে মাটির কণাগুলোর নাম ও আয়তন নিচে উলে- খ করা হলো:

মাটি কণার নাম	আয়তন (মি.মি. ব্যাস)
মোটা বালিকণা	২.০ - ০.২
সূক্ষ্ম বালিকণা	০.২ - ০.০২
পলিকণা	০.০২ - ০.০০২
কর্দমকণা	০.০০২ এর কম

মাটির বুনটের উপর ভিত্তি করে মাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

(১) বেলে মাটি

(২) দো-আঁশ মাটি ও

(৩) এঁটেল মাটি

(১) বেলে মাটি

যে মাটিতে শতকরা ৭০ ভাগ বা তার ও বেশি বালিকণা থাকে তাকে বেলে মাটি বলে। বেলে মাটিতে পলি ও কর্দম কণার পরিমাণ কম থাকে। এ মাটি ঢিলা ও ঝুরঝুরে। পানি ধারণ ক্ষমতা কম এবং জৈব পদার্থের পরিমাণ কম থাকায় এ মাটি অনুর্বর। মোটা কণাযুক্ত বেলে মাটি কৃষি কাজের অনুপোযগী। তবে সূক্ষ্ম কণাযুক্ত বেলে মাটিতে প্রচুর কম্পোস্ট, গোবর ও সবুজ সার প্রয়োগ করে চিনা, কাউন, ফুটি, আলু, তরমুজ ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব। দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার কিছু অঞ্চলে ও অন্যান্য জেলার প্রধানত নদীর চর ও তীরে এ মাটি দেখা যায়।

(২) দো-আঁশ মাটি

যে মাটিতে বালিকণার পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগের কম কিন্ড্রু ২০ ভাগের বেশি তাকে দো-আঁশ মাটি বলে। তবে আদর্শ দো-আঁশ মাটিতে অর্ধেক বালিকণা এবং বাকি অর্ধেক পলি ও কর্দম কণা থাকা আবশ্যক। এ মাটির পানি শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা বেলে মাটির তুলনায় বেশি। চাষআবাদের জন্য এ মাটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এ জন্য সব ধরনের ফসল এ মাটিতে ভাল জন্মে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকার মাটি দো-আঁশ প্রকৃতির। কৃষিক্ষেত্রে দো-আঁশ মাটিকে আদর্শ মাটি বলা হয়।

দো-আঁশ মাটিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

(ক) বেলে দো-আঁশ মাটি;

(খ) পলি দো-আঁশ মাটি;

(গ) এঁটেল দো-আঁশ মাটি।

(ক) বেলে দোআঁশ মাটি

যে মাটিতে বালিকণার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি সে মাটিকে বেলে দো-আঁশ মাটি বলে। এ মাটিতে বালির পরিমাণ সাধারণত শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ থেকে ৬৫ ভাগ পর্যন্ত

হতে পারে। তিস্ড়ার পলি অঞ্চলে এ মাটি পাওয়া যায়। এ মাটিতে আলু, মূলা, তামাক, মরিচ ইত্যাদি ফসল ভাল জন্মে।

(খ) পলি দো-আঁশ মাটি

যে মাটিতে পলিকণার পরিমাণ বেশি থাকে সে মাটিকে পলি দো-আঁশ মাটি বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পলি দো-আঁশ মাটি অধিকহারে পরিলক্ষিত হয়। এ মাটিতে ধান, পাট, ইক্ষু ও শাকসবজি ভাল জন্মে।

(গ) এঁটেল দো-আঁশ মাটি

যে দো-আঁশ মাটিতে কর্দম ও পলিকণার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি তাকে এঁটেল দো-আঁশ মাটি বলে। এ মাটিতে সাধারণত শতকরা ৩৫ ভাগ কর্দম ও প্রায় সম পরিমাণ পলিকণা থাকতে পারে। গঙ্গার বিধৌত সমভূমি অঞ্চলে এ মাটি বেশি দেখা যায়। এ মাটিতে ধান, গম, তুলা সরিষা, ডাল প্রভৃতি ফসল ভাল জন্মে।

(৩) এঁটেল মাটি

যে মাটিতে কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ কর্দমকণা থাকে তাকে এঁটেল মাটি বলে। এ মাটিতে পলিকণা ও বেশি থাকে। ভেজা অবস্থায় এ মাটি খুব নরম ও শুষ্ক অবস্থায় অত্যন্ত শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। এঁটেল মাটিকে ভারী মাটিও বলা হয়। এ মাটিতে ছিদ্র কম থাকায় পানি শোষণ ক্ষমতা কম কিন্তু পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। ঢাকা জেলার উত্তরাংশ টাঙ্গাইল জেলার পূর্বাংশ ও ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এ মাটি দেখা যায়। এ মাটিতে চাষ করা খুব কষ্টকর। প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ করে চাষ উপযোগী করা সম্ভব। ধান, পাট, ইক্ষু, শাকসবজি এ মাটিতে ভাল জন্মে।

সারমর্ম

- ক্ষয়ীভূত শিলা ও নানা প্রকারের জৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত ভূত্বকের বাইরের দিকের স্তরে গাছপালা জন্মে এবং যে স্তর থেকে গাছপালা পুষ্টি উপাদান শোষণ করে বেঁচে থাকে, তাকে মাটি বলে।
- মাটি প্রধানত চারটি উপাদান দ্বারা গঠিত। যথা– খনিজ পদার্থ বা অজৈব পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি ও বায়ু।
- মাটির কণা বলতে মাটিতে উপস্থিত বালি, পলি ও কর্দম কণাকে বুঝায়।
- মাটির একক কণার পারস্পরিক সমন্বয়কে বুনট বলে।
- বুনট অনুসারে মাটি তিন প্রকার। যথা– বেলেমাটি, দো-আঁশ মাটি ও এঁটেল মাটি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

১। মাটির প্রধান গঠন উপাদান কয়টি ?

(ক) ৮টি (খ) ৩টি

(গ) ৫টি (ঘ) ৪টি

২। ফসল উৎপাদনের জন্য কোনটি আদর্শ মাটি?

(ক) বেলে মাটি (খ) দো-আঁশ মাটি

(গ) এঁটেল মাটি (ঘ) এঁটেল দো-আঁশ মাটি।

৩। আদর্শ মাটিতে শতকরা কত ভাগ জৈব পদার্থ থাকে?

(ক) শতকরা ৫ ভাগ (খ) শতকরা ৪ ভাগ

(গ) শতকরা ৬ ভাগ (ঘ) শতকরা ৮ ভাগ

৪। জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে মাটির অণুজীবগুলো কী অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

(ক) মরে যায় (খ) নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে

(গ) কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় (ঘ) অপরিবর্তিত থাকে

৫। পলিকণার আয়তন কত মি.মি.?

(ক) ২.০ মি. মি. এর বেশি (খ) ২.০-০.২ মি. মি.

(গ) ০.২ - ০.০২ মি.মি. (ঘ) ০.০২ - ০.০০২ মি.মি.

পাঠ-১.৩ : মাটির উর্বরতা

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাটির উর্বরতা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির উপায় বলতে পারবেন।

মাটির উর্বরতা

উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক পরিমাণে ও সমানুপাতে সরবরাহ করার ক্ষমতাকে মাটির উর্বরতা বলে। আমরা তখনই কোন মাটিকে উর্বর বলি যখন উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় সব উপাদানই অনুকূল পরিবেশে ঐ মাটি থেকে গ্রহণ করতে পারে। যে সব কারণ মাটির উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

(ক) প্রাকৃতিক কারণ ও

(খ) কৃত্রিম কারণ

প্রাকৃতিক কারণগুলো হলো– মাটির উৎসবস্তু, মাটি গঠনের প্রক্রিয়া, জৈব পদার্থ, মাটির বন্ধুরতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বায়ু প্রবাহ, মাটির বয়স ইত্যাদি।

কৃত্রিম কারণগুলো হলো : জমি চাষাবাদ পদ্ধতি, ফসলের প্রকৃতি, সারের প্রকৃতি ও পরিমাণ, মাটির আর্দ্রতা, মাটির অম্লমান, মাটি সংরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি।

মাটির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায়

আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে অধিক হারে ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন হচ্ছে।আর ফসল উৎপাদন বাড়াবার জন্য একই জমিতে কয়েকবার ফসল ফলানোর প্রয়োজন পড়ছে। ফলে মাটির উর্বরতার উপর ক্রমাগত চাপ বাড়ছে। এমতাবস্থায় মাটির উর্বরতা রক্ষা ও বাড়তি খাদ্য চাহিদা মেটাতে উর্বরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলে আস্তে আস্তে মাটির উর্বরতা হ্রাস পাবে এবং এক সময় মাটি উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। নিচে কী কী উপায়ে মাটির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ভূমিক্ষয় রোধ করা

ভূমিক্ষয়ের ফলে উপরের মাটি স্থানচ্যুত হলে ভূমি উর্বরতা হারায়। মাটির উর্বরতা রক্ষা করতে হলে ভূমিক্ষয় রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা ভূমির উপরিভাগ জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ।

মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ

উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সবগুলো পুষ্টি উপাদান জৈব পদার্থ হতে পাওয়া যায়। এ জন্য জৈব পদার্থকে মাটির প্রাণ বলা হয়। আদর্শ মাটিতে শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকা প্রয়োজন। মাটিতে জৈব পদার্থের আশঙ্কাজনক পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ।

সুষম সার ব্যবহার

উদ্ভিদের জীবন ধারণ, বর্ধন ও পুষ্টির জন্য মাটি থেকে সবসময়ই কিছু খাদ্যোপাদান পরিশোষণ করে। ফলে মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য মাটিতে সুষম আকারে বিভিন্ন জৈব, অজৈব ও অণুজীব সার প্রয়োগ করতে হবে। ফসলের প্রয়োজনের ভিত্তিতে রকম ও পরিমাণ ঠিক করে যে সার সরবরাহ করা হয় তাকে সুষম সার বলে। সুষম সার প্রয়োগ করলে জমির উর্বরতা রক্ষা পায়।

শিম জাতীয় উদ্ভিদ চাষ

শিম জাতীয় উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হলো এর শিকড়ে এক ধরনের অণুজীব বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে মূলের গুটির মধ্যে ধরে রাখে। উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য বেশি পরিমাণ নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয়। এ জন্য নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করতে জমিতে শিম জাতীয় উদ্ভিদ চাষ করা প্রয়োজন।

জমির মাটির অম্লমান নিয়ন্ত্রণ

মাটির অম্লমান বেড়ে গেলে অর্থাৎ পি এইচ (P^H) মান অনেক কমে গেলে জমিতে অনেক ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। P^H মান দিয়ে মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নির্ণয় করা হয়। মাটির অম্লমান বেড়ে গেলে জমিতে চুন প্রয়োগ করে অম্লত্ব দূর করা হয়। মাটির নিরপেক্ষ পি এইচ এর মান ৭ গ্রাম মোলস/লিটার । P^H মান ১–৬.৯ পর্যন্ত অম্লমান এবং সাধারণত P^H মান ৭.১–১৪ কে ক্ষারমান ধরা হয়।

শস্য পর্যায় অবলম্বন : একই জমিতে প্রতিবছর একই ফসল বার বার চাষ করলে মাটির একটি নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান কমে যায়। তাই পর্যায়ক্রমিকভাবে অর্থাৎ প্রথমে এক জাতীয় ফসলের পর অন্য ধরনের ফসল চাষ করলে মাটির উর্বরতার সমতা রক্ষা পায়। যেমন– কোন জমিতে ধান (অগভীর শিকড়যুক্ত ফসল) চাষের পর যেখানে পাট (গভীর শিকড়যুক্ত ফসল) চাষ করা যেতে পারে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছা ফসলের শত্রু। আগাছা উদ্ভিদের পুষ্টি, পানি. আলো, জায়গা প্রভৃতি ব্যবহারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, ফলে প্রকৃত ফসলের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। তাই সময়মতো আগাছা দমন করলে মৃত্তিকার রস, পুষ্টির অপচয় রোধ পাবে যা মাটির উর্বরতা রক্ষার সহায়ক হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা

উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান মাটি থেকে দ্রবীভূত অবস্থায় শোষণ করে। সে জন্য মাটিতে পরিমিত পানি থাকা আবশ্যক। জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকারী অণুজীবের স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত রসের উপস্থিতি প্রয়োজন। অন্যদিকে অতিরিক্ত পানি ফসলের বৃদ্ধিকে বাধা দেয় এমনকি ফসলকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে ফেলতে পারে। ফলে জমিতে পরিমিত সেচ প্রদান ও অতিরিক্ত পানি নিকাশের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

উত্তমরূপে জমি তৈরি

জমি ভালভাবে চাষ ও মই দিলে উপরিভাগে ঝুরঝুরে ও নরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় উদ্ভিদ সহজেই তার শিকড় বিস্তার করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে পারে। এছাড়া উত্তমরূপে জমি চাষ করলে মাটিতে জৈব ও অজৈব পদার্থ ভালভাবে মিশতে পারে, ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

জমিকে বিশ্রাম দেওয়া

দীর্ঘদিন যাবত বারবার চাষাবাদের ফলে মাটির ভৌত রাসায়নিক ও জৈব ধর্মের অবনতি ঘটে। তাই কয়েক বছর পর পর জমিকে এক বা একাধিক মৌসুমের জন্য বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন।

সারমর্ম

- ❒ উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক পরিমাণে ও সমান অনুপাতে সরবরাহ করার ক্ষমতাকে উর্বরতা বলে।
- ❒ যে সব কারণ মাটির উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করে তা হলো : প্রাকৃতিক কারণ ও কৃত্রিম কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। জমিতে পানি সেচের ফলে কী ঘটে?
(ক) মাটি শক্ত হয় (খ) মাটি রসালো হয়
(গ) পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয় (ঘ) গাছ মরে যায়

২। মাটিতে জৈব পদার্থের আশঙ্কাজনক শতকরা পরিমাণ কত?
(ক) শতকরা ৫ ভাগ (খ) শতকরা ৪ ভাগ
(গ) শতকরা ৩ ভাগ (গ) শতকরা ২ ভাগ

৩। কোনটি মাটির উর্বরতার কৃত্রিম কারণ ?
(ক) ফসলের প্রকৃতি (খ) মাটির উৎস বস্তু
(গ) মাটির বন্ধুরতা (ঘ) মাটির বয়স

৪। আদর্শ মাটিতে কী পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকে?
(ক) শতকরা ২ ভাগ (খ) শতকরা ৩ ভাগ
(গ) শতকরা ৫ ভাগ (ঘ) শতকরা ৪ ভাগ

৫। নিচে কোনটি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়?
(ক) শস্য পর্যায় অবলম্বন (খ) ভাল বীজ ব্যবহার
(গ) শিম জাতীয় উদ্ভিদ চাষ (ঘ) উত্তমরূপে জমি তৈরি

পাঠ - ১.৪ : ভূমিক্ষয় ও সংরক্ষণ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ভূমিক্ষয়ের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ভূমিক্ষয়ের প্রকারভেদ আলোচনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার ভূমিক্ষয়ের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ভূমিক্ষয়ের অপকারিতা বলতে পারবেন।
- ভূমিসংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিক্ষয়

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক কারণ যেমন- বায়ুপ্রবাহ, পানি প্রবাহ, বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য কারণে ভূমির উপরিভাগের উর্বর মাটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে। কৃষি জমির উপরিভাগ থেকে ১৫-২০ সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বেশি পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে এ পুষ্টি উপাদানের স্থানান্তর ঘটে, ফলে জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে। ভূমিক্ষয় প্রধানত দু'ভাগে হয়ে থাকে। যথা-

(১) পানি দ্বারা ভূমিক্ষয় ও

(২) বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয়।

(১) পানি দ্বারা ভূমিক্ষয় : পানির চলাচল অথবা দ্রুত পানি প্রবাহের ফলে যে ভূমিক্ষয় হয়ে থাকে তাকে পানি দ্বারা ভূমিক্ষয় বলে। এ ধরনের ভূমিক্ষয়কে আবার ৫ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–

(ক) আস্তরণ বা পাত ভূমিক্ষয়

বৃষ্টিপাত বা সেচ কার্যের পর ভূমির পানি যখন চারদিকে সরে যেতে থাকে তখন উপরিভাগের মাটির ক্ষয় হয়। এ ক্ষয়ক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে ঘটে বলে সহজে দেখা যায় না। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় মাটির উপরিভাগের অতি সারবস্তু অপসারিত হয় বলে মাটি ব্যাপকভাবে তার উর্বরতার শক্তি হারায়। এ জাতীয় ভূমিক্ষয়কে পাত ভূমিক্ষয় বা আস্তরণ ভূমিক্ষয় বলে। সমতল ভূমির চেয়ে কিছুটা ঢালু জমিতে এরূপ ভূমিক্ষয় অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়ে থাকে।

(খ) রিল ভূমিক্ষয়

একে পাত ভূমিক্ষয়ের দ্বিতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। মাটির উপরের স্তর ক্রমাগতভাবে ক্ষয় হতে থাকলে কিছু দিন পর ভূমির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নালার সৃষ্টি হয়। এসব সরু নালা পানি চলাচলের বেগে ধীরে ধীরে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় বড় হয়ে প্রশস্ত নালার সৃষ্টি করে। মাটির এ ধরনের ক্ষয়কে বলা হয় রিল ভূমিক্ষয়।

(গ) নালী ভূমিক্ষয়

রিল ভূমিক্ষয় অবাধে চলতে থাকলে ছোট ছোট নালাগুলো প্রতিবছর ক্ষয়ে ক্ষয়ে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি পেয়ে বড় বড় নালার সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় ভূমিক্ষয়কে নালী ভূমিক্ষয় বলে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হলে কয়েকবছরের মধ্যে এরূপ অনেক নালার সৃষ্টি হয়ে ফসলী জমি আবাদ অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

(ঘ) নদীকূলের ভূমিক্ষয়

প্রবল স্রোতের বেগ, ঢেউ বা জলোচ্ছাসের কারণে নদীর পাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও ভেঙ্গে যায়। নদীতে জোয়ার শুরু ও শেষ হবার সময় এমন ভাঙ্গনের গতি বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের

ভূমিক্ষয়কে নদীকূল ভূমিক্ষয় বলে। নদী ভূমিক্ষয় দু'ভাবে হতে পারে–(i) নালা বা খালের পথে নদীর ধারা বেগে বয়ে এসে নদীতে পড়ে তখন এসব পানি পথের সাথে নদীর মিলনস্থল পানির প্রবল বেগ সইতে না পেরে কিছুদূর পর্যন্ত দু'পাড়ে ভেঙ্গে পড়ে। (ii) নদীর পাড় নিজ হতেই ভেঙ্গে পড়ে, এ অবস্থা নদীর বাঁকের মুখেই সবচেয়ে বেশি হতে দেখা যায়।

(ঙ) সাগরকূলের ভূমিক্ষয়

সাগরের উপকূলভাগ জলোচ্ছ্বাস ও ঢেউ এর ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রের উপকূলীয় দ্বীপসমূহে এরূপ ভূমিক্ষয় হতে দেখা যায়।

(২) বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয়

বায়ুর প্রভাবে জমির মাটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাওয়াকে বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয় বলে। উন্মুক্ত স্থান বা অল্পসংখ্যক বৃক্ষপূর্ণ স্থানে বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয় অধিকহারে পরিলক্ষিত হয়। মরু অঞ্চলের ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ হলো বায়ু প্রবাহ। এ সমস্ত স্থানে জমির উপরিভাগের মাটি বায়ু প্রবাহ দ্বারা একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ধূলিময় অথবা বেলে প্রকৃতির মাটি বায়ু প্রবাহ দ্বারা অধিকহারে ক্ষয় হয়ে থাকে। এ ছাড়া চাষাবাদের পর মাটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মিহি হলে বায়ু প্রবাহ দ্বারা ভূমিক্ষয় হতে পারে।

ভূমিক্ষয়ের অন্যান্য কারণ

পানি ও বায়ু ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে ভূমিক্ষয় ঘটতে পারে। যথা-

১. বৃষ্টিপাত
২. ভূমির ঢাল
৩. মাটির প্রকৃতি
৪. শস্যের প্রকার
৫. জমি চাষ পদ্ধতি
৬. অত্যধিক পশুচারণ
৭. মানব কার্যাবলি

১. বৃষ্টিপাত

ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ হলো বৃষ্টিপাত। এর তীব্রতা সংখ্যা এবং পরিমাণ সরাসরি ভূমিক্ষয়ের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। বড় আকারে বৃষ্টির ফোঁটা মাটিকে সজোরে আঘাত করলে মাটির কণা পানির সাথে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। ঘন ঘন এবং অনেক সময় ধরে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে মৃত্তিকার শোষণ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এমন অবস্থায় অতিরিক্ত পানির সাথে বিযুক্ত মাটির কণা মিশে জমির উপর দিয়ে নিচের দিকে ধাবিত হয়। প্রবাহমান পানির বেগ যত বেশি হবে মাটির ক্ষয়ও তত বেশি হয়।

২. ভূমির ঢাল

ভূমির ঢাল মাটি ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। যে জমি যত বেশি ঢালু এবং ঢালের দৈর্ঘ্যও বেশি, সে জমির মাটি ক্ষয় তত বেশি হয় কারণ অধিকতর ঢালু জমিতে প্রবাহমান পানির বেগও অধিক হয়ে থাকে।

৩. মাটির প্রকৃতি

মাটির বুনট মাটি কণার দানাবন্ধন ও জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর মাটির ক্ষয় অনেকাংশে নির্ভর করে হাল্কা, দানাদার ও জৈব পদার্থযুক্ত মাটি ছিদ্রবহুল বলে বৃষ্টির পানি সহজেই

শোষিত হয়। এ ধরনের মাটির ক্ষয় কম হয়। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ভারী এঁটেল জাতীয় মাটির ছিদ্রতা কম থাকায়, এ মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা কম; এ ধরনের মাটি অল্প বৃষ্টিতেও অধিক ক্ষয় হয়।

৪. শস্যের প্রকার

শস্য নির্বাচন করে মাটির ক্ষয় কমানো সম্ভব। চীনাবাদাম, খেশারি, বরবটি, সয়াবিন প্রভৃতি অধিক পাতাযুক্ত ফসলের চাষাবাদে ভূমিক্ষয় কম হয়। অন্যদিকে ইক্ষু, ভূট্টা, তুলা প্রভৃতি কম পাতাযুক্ত ফসলের চাষাবাদে ভূমিক্ষয় বেশি হয়।

৫. জমির চাষ পদ্ধতি

জমির প্রকৃতি না বুঝে জমি চাষ করলে উপরিস্তরের উর্বর মাটির ক্ষয়সাধন বেশি হয়ে থাকে। যেমন– অসমতল বিশেষ করে পাহাড়ি জমিতে ঢালের আড়াআড়ি চাষ না করে ঢাল বরাবর চাষ করলে ভূমিক্ষয় বেশি হয়।

৬. অত্যধিক পশুচারণ

অত্যধিক বা অনিয়মিত পশুচারণ ভূমিক্ষয়ের আর একটি অন্যতম কারণ। অত্যধিক পশুচারণে পশুর পা দ্বারা ভূমির মাটি অধিকহারে অপসারিত হয়।

৭. মানব কার্যাবলি

মানুষ ভূমিক্ষয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। সাধারণ অবস্থায় বনজঙ্গল বা মাঠ-ঘাটে ভূমিক্ষয় ঘটে না। মানুষ অপরিকল্পিতভাবে ব্যাপকভাবে গাছপালা কেটে ফেললে জমি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

ভূমিক্ষয়ের অপকারিতা

ভূমিক্ষয়ের ফলে জমির উপরিভাগের উর্বর ও নরম মাটি অপসারিত হয়ে থাকে। কৃষি জমির উপরিভাগের সাধারণত ১৫-২০ সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মজুদ থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে জমির এ স্তরের মাটি পুষ্টিসহ অন্যত্র অপসারিত হয়, ফলে জমি ধীরে ধীরে তার উর্বরতা হারায় এবং পর্যায়ক্রমে ফলন হ্রাস পায়। ভূমিক্ষয়ের ফলে পানিবাহিত মাটির অপেক্ষাকৃত ভারী কণাগুলো তলদেশে জমা হয়ে নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হয়ে যায়। ফলে বর্ষাকালে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং শুষ্ক মৌসুমে নৌ-চলাচল, মৎস্য চাষ ও কৃষিকাজে অসুবিধা দেখা দেয়।

ভূমি সংরক্ষণ

আধুনিক কৃষি সম্পর্কিত কার্যক্রমে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান অংশ হলো ভূমিক্ষয় রোধ করা। সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রকৃতি ও মানুষের খামখেয়ালীর হাত থেকে ভুমিক্ষয় রোধ করতে না পারলে বাংলাদেশের প্রধানতম সম্পদ কৃষি বিরাট হুমকির সম্মুখীন হবে। এজন্য খুব শিঘ্রই ভূমিক্ষয় রোধ করতে কৃষক ও সরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। নিচে ভূমি সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. পানির প্রবাহ

বৃষ্টির পানির বেগ কমিয়ে ভূমিসংরক্ষণ সম্ভব। পানির বেগ বিভিন্নভাবে কমানো যেতে পারে। যেমন–

- ❒ জমিতে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় স্থানে আড়াআড়িভাবে ছোট আইল বা বাঁধ তৈরি করা।
- ❒ অসমতল জমি ভালভাবে চাষ করে বা মাটি কেটে সমতল করা।

- ❒ জমির ছোট ছোট নালাগুলো ভরাট করা।
- ❒ বড় নালায় বিভিন্ন আগাছা জমানো এবং শেষ প্রান্তে স্থানে স্থানে খুটি পুঁতে তার সাথে তারের জাল আটকে দেওয়া।
- ❒ নদীর উজানে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা।

২. পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা

কৃষিজমি থেকে দ্রুত পানি সরে যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে সমস্ত মাঠের পানি একত্রে জমে ফেঁপে ওঠে। ফলে পানির গতিবেগ বেড়ে গিয়ে ব্যাপকহারে ভূমিক্ষয় ঘটে। এমন অবস্থায় মাটির নিচের স্তরে টাইল নালা তৈরি করা যেতে পারে, ফলে পানি ধীর গতিতে সরে যাবে।

৩. পর্যাপ্ত জৈব সার প্রয়োগ

মাটিতে অধিক পরিমানে জৈব সার প্রয়োগ করলে মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে পানি সহজেই মাটির ছিদ্রপথে নিচ স্তরে প্রবেশ করতে পারে। এ ছাড়া জৈব পদার্থের হিউমাসের আঠালো বৈশিষ্ট্যের কারণে মাটি কণা পরস্পর শক্তভাবে আটকে থাকে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব পদার্থযুক্ত মাটি সহজেই বায়ু বা পানি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে না।

৪. বনভূমি সৃষ্টি

যে সব অঞ্চলে বায়ু প্রবাহ দ্বারা ভূমিক্ষয় অধিক হয়, সেসব অঞ্চলে বায়ু প্রবাহের দিকে সারি সারি লম্বা ও ঝোপ জাতীয় গাছ লাগানো আবশ্যক। এ সব গাছ বায়ু প্রবাহের বেগ কমিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করে।

৫. ধাপ চাষ

পাহাড়ি অঞ্চলে ঢালু ভূমিতে ভূমিক্ষয় অধিক দেখা যায়। সেখানে শস্যের সারিগুলোকে একই উচ্চতায় রেখে সারিগুলোকে ঢালের বিপরীতে আড়াআড়িভাবে সাজানো হয়। ফলে পানির গতিপথে বাধার সৃষ্টি হয়। পানি সরাসরি গড়িয়ে পড়তে না পারাতে ভূমিক্ষয় রোধ পায়। পাহাড়ের গাত্র কেটে সিঁড়ির ন্যায় ধাপে ধাপে সাজানো হয় বলে একে ধাপ চাষ বলে। প্রতিটি ধাপ দেখতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রের মতো।

৬. জমিকে খন্ড খন্ড করে চাষ

পাহাড়ি অঞ্চল বা অসমতল জমির সমস্ত ঢালে একইভাবে একটি ফসল চাষ না করে সুবিধামত জমি **খন্ড খন্ড** করে ঢাল আড়াআড়ি বিভিন্ন ফসল জন্মাবার পদ্ধতিকে **খন্ড খন্ড** প্লটে শস্য চাষ পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে জমির বিভিন্ন খন্ডে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করা হয়।

৭. অনিয়মিত পশুচারণ রোধ

অত্যধিক পশুচারণে মাটির উপরিভাগ উন্মুক্ত ও আলগা হয়ে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি করে। তাই অনিয়মিত পশুচারণ রোধ করে ভূমি সংরক্ষণ সম্ভব।

৮. বাঁধ বা আইল

জমির চারদিকে সুষ্ঠুভাবে বাঁধ বা আইল দিয়ে ভূমি সংরক্ষণ সম্ভব। কেননা এর দ্বারা বৃষ্টি বা সেচের পানি দ্বারা ভূমিক্ষয় রোধ পায়।

সারমর্ম

- বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক কারণ যেমন– বায়ুপ্রবাহ, পানি প্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি এবং অন্যান্য কারণে ভূমির উপরিভাগের উর্বর মাটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে।
- ভূমিক্ষয় প্রধানত দু'ভাবে হতে পারে, যথা–পানি দ্বারা ভূমিক্ষয় ও বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয়।
- মাটির উপরিভাগের ১৫-২০ সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মজুদ থাকে।
- মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সংরক্ষণ ভূমিক্ষয় রোধ করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

১। পুষ্টি উপাদান মাটির কত গভীরতা পর্যন্ত পাওয়া যায় ?
(ক) ১৫-২০ সে. মি. (খ) ১০-১৫ সে. মি.
(গ) ২০-২৫ সে. মি. (ঘ) ১৬-২২ সে. মি.।

২। ভূমিক্ষয় প্রধানত কত ভাবে ঘটতে পারে?
(ক) তিন ভাবে (খ) চার ভাবে
(গ) পাঁচ ভাবে (ঘ) দুই ভাবে

৩। নদীকূলের ভূমিক্ষয় কেন হয়?
(ক) বায়ু প্রবাহের ফলে (খ) পানির প্রবল স্রোতের কারণে
(গ) পশুচারণের ফলে (ঘ) মাটির প্রকৃতির কারণে

৪। ধাপ চাষ সাধারণ কোন অঞ্চলে করা হয়ে থাকে ?
(ক) জলাভূমি অঞ্চল (খ) সমতল বনভূমি অঞ্চল
(গ) পাহাড়ি অঞ্চলে (ঘ) সমতল কৃষি জমিতে

পাঠ-১.৫ : উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান

এ পাঠ শেষে আপনি–

- উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- পুষ্টি উপাদানগুলোর শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- পুষ্টি উপাদানগুলোর উৎস, কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।

উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পুষ্টি ও প্রজননের জন্য যে সব উপাদান উদ্ভিদ মাটি, পানি ও বায়ু থেকে গ্রহণ করে তাকে পুষ্টি উপাদান বলে। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ১৬ টি অজৈব উপাদান প্রয়োজন। এ উপাদানগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলা হয়।

- ❒ এ উপাদানগুলো উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও প্রজননের জন্য প্রয়োজন।
- ❒ এ উপাদানগুলোর যে কোন একটির অভাবে উদ্ভিদের অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উদ্ভিদে রোগের সৃষ্টি হয়।
- ❒ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের অভাব অন্য একটি উপাদান পূরণ করতে পারে না।

মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কি পরিমাণে আছে তা গাছপালার পাতা, বৃদ্ধি, ফলন ইত্যাদি দেখে বুঝা যায়। এছাড়া মাটি ও গাছপালা রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করেও পুষ্টির অবস্থা জানা যায়।

অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদানের শ্রেণিকরণ

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কি পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান দরকার তার উপর ভিত্তি করে অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- ❒ মুখ্য পুষ্টি উপাদান ও
- ❒ গৌণ পুষ্টি উপাদান।

মুখ্য পুষ্টি উপাদান

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যে সকল পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমাণে দরকার হয় তাদেরকে মুখ্য পুষ্টি উপাদান বলে। যথা–

কার্বণ (C)

হাইড্রোজেন (H)
অক্সিজেন (O)

নাইট্রোজেন (N)

ফসফরাস (P)
পটাশিয়াম (K)
ক্যালসিয়াম (Ca) গন্ধক (S)
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)

গৌণ পুষ্টি উপাদান

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যে সকল পুষ্টি উপাদান তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে গৌণ পুষ্টি উপাদান বলা হয়। যথা–

লৌহ (Fe)	দস্ত্র (Zn)
ম্যাঙ্গানিজ (Mn)	বোরণ (B)
মলিবডেনাম (Mo)	কোবাল্ট (Co)
তামা (Cu)	ক্লোরিন (Cl)

পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্তির উৎস

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান উৎস দুইটি। যথা–

❒ প্রাকৃতিক উৎস ও

❒ কৃত্রিম উৎস

প্রাকৃতিক উৎস

মাটি, বায়ু ও পানি পুষ্টি উপাদানের প্রাকৃতিক উৎস। পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে উদ্ভিদ কার্বন ও অক্সিজেন বায়ু থেকে এবং হাইড্রোজেন পানি থেকে গ্রহণ করে। বাকি উপাদানগুলো উদ্ভিদ মাটি থেকে গ্রহণ করে।

কৃত্রিম উৎস

জৈব সার ও রাসায়নিক সার হচ্ছে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের কৃত্রিম উৎস।

জৈব সার

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের প্রায় সবগুলোই জৈব পদার্থে পাওয়া যায়। গোবর, কম্পোস্ট, খড়কুটা, খৈল, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদিকে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রাসায়নিক সার

ইউরিয়া, টি এস পি, এম পি, জিপসাম প্রভৃতি রাসায়নিক সার। এসব সার হতে যথাক্রমে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও গন্ধক পাওয়া যায়।

মুখ্য পুষ্টি উপাদানগুলোর উৎস, কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ নিম্নরূপ–

১। নাইট্রোজেন

উৎস : মাটিতে নাইট্রোজেনের উৎস নাইট্রোজেন লবণ। বায়ুমন্ডলে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ সরাসরি বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশে ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রোজেন জাতীয় সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ইউরিয়াতে শতকরা ৪৬ ভাগ এবং অ্যামোনিয়াম সালফেটে শতকরা ২০.৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে।

কাজ

(i) উদ্ভিদের কান্ড, পাতা ও অন্যান্য অংশ গাঢ় সবুজ হয়।

(ii) উদ্ভিদের শাখা–প্রশাখার বৃদ্ধি ঘটায়।

(iii) অধিক কুশি সৃষ্টিতে নাইট্রোজেন সহায়তা করে।

(iv) পাতার আকৃতি বড় করে ফলে উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায়।

(v) ফুল ও ফলের আকৃতি বড় করে।

(vi) দানা জাতীয় ফসলে কুশির সংখ্যা, বীজের পুষ্টতা এবং বীজে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধিপায়।

অভাবজনিত লক্ষণ

নাইট্রোজেনের অভাবে :

(i) উদ্ভিদের পাতা প্রাথমিক অবস্থায় হালকা সবুজ, ঘাটতি আরো বেশি দেখা দিলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

(ii) হলুদ বর্ণ সর্বপ্রথমে নিচের দিকের পাতা থেকে শুরু হয়।

(iii) উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(iv) দানা জাতীয় ফসলের কৃশি সংখ্যা, বীজের পুষ্টতা এবং আমিষের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(v) ফলন কমে যায় এবং ফল পুষ্ট হয় না।

(vi) ফলগাছের পাতা ঝরে পড়ে।

২। ফসফরাস

উৎস : টি এস পি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) ও ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডি,এপি) আমাদের দেশে ফসফেটের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টি এস পিতে শতকরা ৪৮-৫২ ভাগ এবং ডিএপিতে শতকরা ৫৪ ভাগ ফসফেট থাকে।

কাজ

(i) উদ্ভিদের কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে।

(ii) উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

(iii) পার্শ্ব ও গুচ্ছ মূল উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

(iv) খাদ্য পরিবহনে সহায়তা করায় ফল ও বীজের পুষ্টতা বৃদ্ধি করে এবং ফসলের পরিপক্বতা ত্বরান্বিত হয়।

(v) মাইটোকনড্রিয়ার স্বাভাবিক কাজের জন্য ইহা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে মাইটোকনড্রিয়া কোষের শ্বষণের কেন্দ্র বা ক্ষমতার উৎস।

অভাবজনিত লক্ষণ

ফসফরাসের অভাবে :

(i) পাতা বেগুনী বা লালচে বর্ণে পরিণত হয়।

(ii) মূলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(iii) কোষ বিভাজনে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এতে গাছ বামনাকৃতির হয়।

(iv) খাদ্য পরিবহনে বিলম্ব হওয়ায় ফসলের পরিপক্বতায় বিলম্ব ঘটে।

(v) পাতা ও ফুলের সংখ্যা কমে যায়।

(vi) ফলের আকার ছোট হয় এবং ফল ঝরে যায়।

(vii) লিগুমিনাস ফসলের মূলে গুটি উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।

৩। পটাশিয়াম

উৎস : উদ্ভিদ মাটি হতে আয়ন হিসেবে পটাশিয়াম শোষণ করে। মিউরেট অব পটাশ (এম পি) হতে পটাশিয়াম পাওয়া যায়। এই সারগুলো যথাক্রমে ৬০ এবং ৫০ ভাগ পটাশ থাকে।

কাজ

(i) উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

(ii) পাতায় শর্করা উৎপাদনে সহায়তা করে।

(iii) কোষ বিভাজনে সহায়তা করে।

(iv) পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ রাখতে পটাশিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম।

(v) উদ্ভিদে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস শোষণে সাম্যতা রক্ষা করে।

(vi) দানাদার ফসল হেলে পড়ে না।

(vii) ফসলের ক্ষরা সহ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

অভাবজনিত লক্ষণ

পটাসিয়ামের অভাবে :

(i) গাছের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

(ii) গাছের পাতার কিনারা তামাটে বর্ণ ধারণ করে।

(iii) দানাদার ফসল হেলে পড়ে যেতে পারে।

(iv) গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

(v) সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়।

(vi) খরা ও তুষারপাত সহ্য ক্ষমতা কমে যায়।

৪। ক্যালসিয়াম

উৎস : ক্যালসিয়াম মাটিতে ক্যালসিয়াম লবণ হিসেবে থাকে। উদ্ভিদ ক্যালসিয়াম আয়ন হিসেবে ইহা শোষণ করে। জিপসাম বা ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ সারে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২২ ভাগ।

কাজ

i) উদ্ভিদ কোষের প্রাচীর গঠনে সহায়তা করে।

ii) উদ্ভিদের মূল গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

iii) ডাল জাতীয় ফসলের ফলন বাড়ায়।

অভাবজনিত লক্ষণ

ক্যালসিয়ামের অভাবে :

(i) কচি পাতায় মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়।
(ii) মূলের বৃদ্ধি বাধা পায়।
(iii) পাতার স্বাভাবিক সবুজ বর্ণ বিবর্ণ হয়।
(iv) ফুল ফোটার সময় উদ্ভিদের কান্ড শুকিয়ে যায় এবং উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে।
(v) উদ্ভিদের শীর্ষ ভাগ মরে যায়।

৫। ম্যাগনেসিয়াম

উৎস : ম্যাগনেসিয়াম মাটিতে ম্যাগনেসিয়াম লবণ হিসেবে থাকে। উদ্ভিদ ম্যাগনেসিয়াম আয়ন হিসেবে উহা শোষণ করে। ইপসম লবণ ম্যাগনেসিয়ামের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ সারে ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৯.৬ ভাগ।

কাজ

(i) সালোকসংশ্লেষণে সহায়তা করে।
(ii) ফসফরাস শোষণে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ

ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে-

i) পাতার দুই শিরার মধ্যবর্তী এলাকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
ii) পাতা ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যায়।

৬। গন্ধক

উৎস : মাটিতে সালফেট লবণ হিসেবে থাকে। উদ্ভিদ সালফেট ও সালফাইড আয়ন হিসেবে তা শোষণ করে। ক্যালসিয়াম সালেফেট বা জিপসাম গন্ধকের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জিপসামে শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ গন্ধক থাকে।

কাজ

(i) গাছের সবুজ কণিকা তৈরিতে সহায়তা করে।
(ii) তেল জাতীয় শস্যের তৈল উৎপাদন বাড়ায়।
(iii) গাছের দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
(iv) লিগুমিনাস ফসলের মূলে নাইট্রোজেন গুটি উৎপাদনে সহায়তা করে।
(v) উদ্ভিদে নাইট্রোজেন আত্মিকরণে যোগসূত্র রক্ষা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ

গন্ধকের অভাবে :

(i) উদ্ভিদের কোষ বিভাজনে বিঘ্ন ঘটে।
(ii) গাছ খর্বাকৃতির হয়।

(iii) পাতা ছোট ও বিবর্ণ হয়। এতে কেবল কচিপাতা বিবর্ণ হয়।
(iv) কান্ডের শীর্ষ বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পার্শ্ব কুড়ি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

গৌণ পুষ্টি উপাদানগুলোর উৎস, কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ নিম্নরূপ-

১। লৌহ

উৎস : লৌহের উৎস হিসেবে ফেরাস সালফেট সার ব্যবহার করা হয়। এ সার মাটিতে কিংবা গাছের পাতায় প্রয়োগ করা হয়।

কাজ

(i) উদ্ভিদের সবুজ কণা (ক্লোরোফিল) সৃষ্টিতে সহায়তা করে।
(ii) নাইট্রোজেন শোষণে সাহায্য করে।
(iii) বিভিন্ন প্রকার জারক রসকে ক্রিয়াশীল রাখার জন্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ

লৌহের অভাবে :

i) প্রথমে কচি পাতার সবুজ রং বিবর্ণ হয়।
ii) পাতার সরু শিরার মধ্যবর্তী স্থান হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
iii) গাছ খর্বাকৃতির হয়।

২। দস্তা বা জিংক (Zinc)

উৎস

মাটিতে দস্তা খনিজ লবণ হিসেবে থাকে। উদ্ভিদ জিংক আয়ন হিসেবে তা গ্রহণ করে। জিংক সালফেট নামক সারকে দস্তার উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ সারে শতকরা ৩৬ ভাগ দস্তা ও ১৭ ভাগ গন্ধক থাকে।

কাজ

(i) গাছের বৃদ্ধি ও আমিষ গঠন এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার জারণ কার্যে দরকার।
(ii) ফুল ও ফল উৎপাদনে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ

দস্তার অভাব :

(i) কচি পাতার গোড়া বিবর্ণ হয়ে যায়।
(ii) পুরাতন পাতা মরচে পড়া বাদামি থেকে হলদে কমলা বর্ণ ধারণ করে যা ফসলকে মরিচা পড়া বাদামি বর্ণের মত করে ফেলে।
(iii) জমিতে চারার বৃদ্ধি সমান না হয়ে কোথাও বড় এবং সাদা কোথাও ছোট থাকে।
(iv) পাতার আকার ছোট হয় এবং কোন কোন পাতার কিনারা কুঁচকে যায়।

(v) লেবু গাছের ক্ষুদ্র পাতায় রোগ দেখা দেয়।

সারমর্ম

- উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পুষ্টি ও প্রজননের জন্য যে সব উপাদান উদ্ভিদ মাটি, পানি ও বায়ু থেকে গ্রহণ করে তাকে পুষ্টি উপাদান বলে।
- উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ১৬ টি।
- উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যে সব পুষ্টি উপাদান অধিক দরকার হয়, তাদেরকে মুখ্য পুষ্টি উপাদান এবং যে সব পুষ্টি উপাদান তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে গৌণ পুষ্টি উপাদান বলে।
- মুখ্য পুষ্টি উপাদান ৯টি; যথা– কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অক্সিজেন ও গন্ধক।
- গৌণ পুষ্টি উপাদান ৮টি; যথা– লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, তামা, দস্তা, বোরণ, কোবাল্ট ও ক্লোরিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় মুখ্য পুষ্টি উপাদান কয়টি ?

(ক) ৬টি (খ) ৯টি
(গ) ৮টি (ঘ) ১০ টি

২। নাইট্রোজেনের কাজ কি?

(ক) উদ্ভিদ খর্বাকৃতি হয় (খ) উদ্ভিদে কোষ বিভাজনে সহায়তা করে
(গ) গাছকে ঘন সবুজ করে (ঘ) কুশির সংখ্যা হ্রাস করে।

৩। নিচের কোনটি গৌণ পুষ্টি উপাদান ?

(ক) পটাশিয়াম (খ) অক্সিজেন
(গ) গন্ধক (ঘ) লৌহ

৪। ইউরিয়াতে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন থাকে?

(ক) ৪৬ ভাগ (খ) ৪৫ ভাগ
(গ) ৪৪ ভাগ (ঘ) ৪৭ ভাগ

৫। নাইট্রোজেনের কৃত্রিম উৎস কোনটি?

(ক) টি এস পি (খ) এম পি
(গ) এস পি (ঘ) ইউরিয়া

ব্যবহারিক

বিষয় -১ ঃ মাটির বুনট শনাক্তকরণ

এ পরীক্ষণ শেষে আপনি–

- মাটির বুনট শনাক্তকরণের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন।
- মাটির বুনট শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ

নমুনা : মাটি, পাত্র ও পানি।

কাজের ধাপ

১। কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করুন।

২। সংগৃহীত নমুনা মাটিতে ঢেলা থাকলে, একটি পাত্রে রেখে তা গুঁড়া করে নিন।

৩। নমুনার একমুঠ গুঁড়া মাটি হাতে নিয়ে পানি মিশান।

৪। হাতের ভিতরে মাটির দলা বানাতে চেষ্টা করুন।

৫। মাটি দলা না হয়, তবে সংগৃহীত নমুনাটি বেলে মাটি।

৬। যদি দলা বানানো যায় এবং চ্যাপ্টা করা যায়, তবে নমুনাটি এঁটেল মাটি।

৭। যদি চ্যাপ্টা করতে গেলে ভেঙ্গে যায়, তবে নমুনাটা দো-আঁশ মাটি।

৮। নমুনা মাটির পরীক্ষণ শেষে, আপনার বাড়ির পার্শ্ববর্তী মাঠের যে কোন মাটি নিয়ে পরীক্ষণটি বারবার করুন। কি ধরনের মাটি তা শনাক্ত করুন।

৯। সবশেষে ব্যবহারিক খাতায়/নোটবুকে পরীক্ষণের সমস্ত তথ্য ধারাবাহিকভাবে লিখুন এবং শিক্ষকের স্বাক্ষর নিন।

বিষয়- ২ : সার পরিচিতি

এ পরীক্ষা শেষে আপনি–

- প্রদত্ত সারের নমুনাগুলো শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ

নমুনা : সার, পাত্র, পলিব্যাগ, কাগজ ও ব্যবহারিক নোটবুক।

কাজের ধাপ

১। প্রদত্ত নমুনা সারগুলোর বর্ণ, গন্ধ, আকার– আকৃতি অনুসারে সনাক্ত করুন।

২। শনাক্তকৃত সারগুলোর নাম লিখুন।

৩। শনাক্তকৃত সারগুলোর যাবতীয় তথ্য ব্যবহারিক নোটবুকে লিখুন এবং শিক্ষকের স্বাক্ষর নিন।

বিষয়-৩ : কমপোস্ট সার তৈরিকরণ

এ পরীক্ষাণ শেষে আপনি–

- কম্পোস্ট সার তৈরির উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন।
- কম্পোস্ট তৈরির জায়গা নির্বাচন করতে পারবেন।
- কম্পোস্ট সার তৈরি করে দেখাতে পারবেন।

উপকরণ

১. আবর্জনা ২. পানি ৩. গোবর ৪. ইউরিয়া ৫. টি এস পি ৬. কাদামাটি ৭. পচনকারী দ্রব্য (যদি থাকে)।

কাজের ধাপ

১. বাড়ির পাশে একটা উঁচু জায়গা নির্বাচন করুন। খেয়াল রাখবেন নির্বাচিত স্থানে যেন বর্ষার পানি না জমে।

২. ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১.২৫ মিটার প্রস্থ জায়গা ফিতা দিয়ে মেপে নিন।

৩. আবর্জনা, খড়কুটা, কচুরিপানা, আগাছা ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্য ফেলে ৩০ সে.মি. উঁচু স্তর তৈরি করুন।

৪. প্রথম স্তর সম্পন্ন হলে আবর্জনার উপর ১ কেজি গুঁড়া খৈল, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম টি এসপি ছিটিয়ে দিন। অথবা প্রতি স্তরে তাজা গোবর, পয়ঃপ্রণালীর আবর্জনা প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করুন।

৫. এরপর পানি দিয়ে স্তরটি ভিজিয়ে দিন।

৬. এরপর ৩ সে.মি. পুরু করে গোবরের প্রলেপ দিন।

৭। এমনিভাবে পরপর সাতটি স্তর সাজান। প্রতিটি স্তরের উপরে একই হারে ইউরিয়া ও টি.এস.পি বা গোবরের প্রলেপ দিন।

চিত্র : কম্পোস্ট গাদার নমুনা

৮. উপরিভাগের স্তরটি কুঁড়েঘরের চালার মত বানান এবং পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিন।

৯. গাদা তৈরি শেষ হলে সপ্তাহখানেক পর একটা শক্ত কাঠি গাদার মাঝখানে ঢুকিয়ে দেখুন যে গাদাটি অতিরিক্ত ভেজা কি না।

১০. গাদা অতিরিক্ত ভেজা হলে মাঝে মাঝে কাঠি ঢুকিয়ে ভিতরে বাতাস প্রবেশ করতে দিন।

১১. গাদা অতিরিক্ত শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে কাঠি ঢুকিয়ে ছিদ্র করে সেখানে পানি ঢালুন।

১২. তাড়াতাড়ি পচনের জন্য একমাস পর কমপোস্ট উল্টে দিন। স্তূপ উল্টানোর সময় স্তরে স্তরে মোট ১০ কেজি এক্টিভেটর দিন।

১৩. দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে কমপোস্ট তৈরি হবে।

১৪. কম্পোস্ট তৈরি হলে স্তূপ ভেঙ্গে শুকিয়ে গুঁড়া করে বস্তায় ভরে রাখুন।

১৫. কম্পোস্ট তৈরির ধাপগুলো অনুশীলন করুন এবং ব্যবহারিক নোটবুকে যাবতীয় তথ্য লিখুন এবং শিক্ষকের স্বাক্ষর নিন।

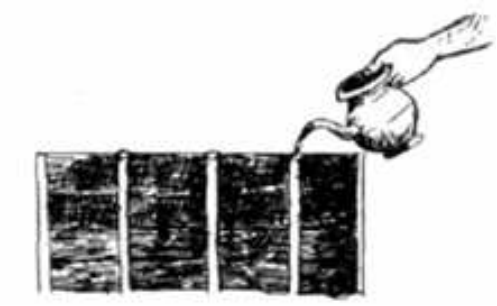

চিত্র : কম্পোস্ট গাদায় পানি দেওয়া

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১। কৃষি আবহাওয়া বলতে কি বুঝেন? কৃষি আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে কয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হয় আলোচনা করুন।

২। জলবায়ু কাকে বলে?

৩। জলবায়ুর ভিত্তিতে বাংলাদেশকে কয়টি শস্য ঋতুতে বিভক্ত করা হয় ? ঋতুগুলোর তুলনামূলক বৈশিষ্ট লিখুন।

৪। মাটির সংজ্ঞা দিন।

৫। মাটি গঠনের উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।

৬। বুনটের উপর ভিত্তি করে মাটির শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।

৭। মাটির উর্বরতা বলতে কি বুঝেন ? মাটির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় আলোচনা করুন।

৮। ভূমিক্ষয় ও ভূমি সংরক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৯। উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের সংজ্ঞা দিন।

১০। পুষ্টি উপাদানের শ্রেণিবিভাগ করুন।

১১। মুখ্য ও গৌণ পুষ্টি উপাদানগুলোর উৎস, কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১ : ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩ : ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। গ ৫। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪ : ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ